Fifteenth Convocation held on April 10, 1981

অশোক মিত্র *

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে আহ্বান করে আপনারা আমাকে যে সম্মানে ভূষিত করেছেন তার সম্যক যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবু আমি এই নিমন্ত্রণ অত্যন্ত আগ্রহে গ্রহণ করেছি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বিশেষ শ্রদ্ধেয় কয়েকজন সুহৃদ অধ্যাপনা করেছেন, এবং জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যে অধ্যয়ন করেছেন বা করছেন। আমার বিশেষ আশা এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও জ্ঞানের আদান প্রদানের যোগসূত্র ক্রমশ দৃঢ়তর ও বহুবিস্তৃত হবে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তনে উপস্থিত থাকার পিছনে আমার ব্যক্তিগত আগ্রহের অন্য কারণও আছে। আমার শৈশব ও বাল্যকালের কিছু বছর শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কার্সিয়াং ও দার্জিলিং শহরে কাটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ও পরে কর্মজীবনের কিছু অংশ দার্জিলিং জেলায় যাপিত হয়। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে সেন্সাস ও গেজেটিয়ার পুনর্লিখন উপলক্ষ্যে এ অঞ্চলে এমন খুব কম স্থান আছে যেখানে বা যার দু-তিন মাইলের মধ্যে আমি যাইনি। উপরন্তু এখানে গত পঁচিশ বছর ধরে যাঁরা প্রশাসনে অথবা রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং আছেন তাঁদের অনেকেই আমার বিশেষ স্নেহ ও সম্মানের পাত্র। তাঁদের কাছে আমি এ অঞ্চলের অনেক কিছু জেনেছি বা শিখেছি। ষাটের দশকে যখন শিলিগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিলিগুড়ি উন্নয়নের খসড়া তৈরী হয় তখন আমি ভারতের প্ল্যানিং কমিশনে কাজ করতুম। আমার খুব আকাঙ্খা ছিল যে ১৯৬৯ - ৭০ সালে সি এম ডি এর সঙ্গে সঙ্গে শিলিগুড়ি ও আসানসোল উন্নয়নের কাজ সমান তালে শুরু হবে। দৈববিপাকে তা সম্ভব হয়নি, হয়ত এইবার হবে। ইতিমধ্যে এই অঞ্চলে নানারকম সাংস্কৃতিক, এবং শিল্পাশ্রয়ী নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং নানাবিধ সংস্থার প্রসার হয়েছে। তবুও ১৯৭০ সালে কাজ শুরু না হওয়ার ফলে, পশ্চিমে নকশালবাড়ী রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে পূর্বে মালশহর পর্যন্ত সমগ্র শিলিগুড়ি অঞ্চলটি আজ বিশেষ বিব্রত ও বিস্রস্ত অবস্থায় পরিণত। আশা করি উন্নয়ন ব্যবস্থার ফলে শিলিগুড়ি অঞ্চলে পুনরায় সুস্থ নগরব্যবস্থার পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা দ্রুত ফিরে আসবে।

অবশ্য দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি অঞ্চলের বর্তমান বা ভবিষ্যত সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনার অভিপ্রায় আজ আমার নেই। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের একটি কঠিন

* অধ্যাপক, জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়া দিল্লী এবং আই. সি. এস (I. C. S.)

সংকট সম্বন্ধে সামান্য আলোচনার ক্ষেত্র আজ আমি প্রস্তুত করতে চাই। উত্তর বঙ্গে এই সমস্যা কত প্রকট, পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে তার কি স্থান, অন্য পক্ষে ভারতের এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সে সংকটে পশ্চিমবঙ্গের কি স্থান তার গৌরচন্দ্রিকা উপস্থাপিত করাই আমার উদ্দেশ্য। আপনারা যারা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর উপাধি পেলেন সমাবর্ত্তন বক্তৃতার অজুহাতে তাঁদের গলায় উপদেশের মোটা ও লম্বা মালা পরাবার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। আমার ইচ্ছা এই সব দুরুহ সমস্যা আপনাদের নবীন, শিক্ষিত প্রাণে ও মনে কি ধরণের ঢেউ বা উদ্বেগ তুলছে তাই জানতে। শিক্ষকতা করে এই প্রতীতিই আমার দৃঢ় হচ্ছে যে ছাত্রদের যৎসামান্য যা শেখাতে পারি তার চেয়ে তাঁদের কাছে আমার অনেক বেশী শেখার আছে। এই সভায় আমার কর্তব্য হলো যে-সমস্যাকে আমি সংকটময় বলে মনে করি তা সাধ্যমত সততা ও সম্যকতার সঙ্গে স্নাতকদের কাছে তুলে ধরা।

(২)

মুখবন্ধ ছেড়ে আসল প্রসঙ্গে আসা যাক। এই প্রবন্ধটির শেষে একটি পরিশিষ্ট সারণি পাবেন। এতে দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে ১৯০১ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সাক্ষরতা কিভাবে অগ্রসর হয়েছে। ভারতীয় সেন্সাসে সাক্ষরতার সংজ্ঞা হচ্ছে যে-কোন একটি সাধারণ রচনা পড়ে বুঝতে এবং লিখতে পারে কিনা। স্কুলে পড়ার হিসাব স্বাক্ষরতায় দিতে হয় না। পরিশিষ্টে দেখি ১৯০১ সালে সারা পশ্চিমবঙ্গে শতকরা মেয়ের (শিশু থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত) মধ্যে মাত্র ১ জন সাক্ষর ছিলেন। ১৯৭১ সালে তা দাঁড়িয়েছে ২২ জনে এবং ১৯৮১ সালে ৩০ জনে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে এখনও শতকরা ৭০ জন মেয়ে নিরক্ষর এবং প্রতি বছরই মোট সাক্ষর মেয়ের চেয়ে মোট নিরক্ষর মেয়ের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে মেয়েদের সাক্ষরতার অগ্রগতি সংক্ষেপে দেখা যাক —

সারণি ১

মেয়েদের শতকরা সাক্ষরতা ১৯০১, ১৯৫১, ১৯৭১

জেলা	১৯০১	১০৫১	১৯৭১
দার্জিলিং	১.৪৩	৯.১১	২৩.২২
জলপাইগুড়ি	০.৩৬	৬.১১	১৫.০৩
কুচবিহার	০.৪৪	৪.৭৮	১১.৯২
পশ্চিমদিনাজপুর	০.২৬	৬.৬৩	১২.৩৭
মালদহ	০.২১	৩.৬৫	৯.৩৩
পশ্চিমবঙ্গ	১.১০	১২.৭৩	২২.৪১

সামান্য সাক্ষরতা উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় কোথায় পিছিয়ে আছে তা এই সংখ্যাগুলিতে বেশ স্পস্ট হয়।

১৯৫১ সালের সেন্সাসে সাক্ষরতায় সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থান ছিল। প্রথম ছিল কেরালা। ১৯৭১ সালে ছিল ত্রয়োদশ স্থানে। ১৯৮১ সালেও কেরালা প্রথম স্থানে অধিষ্ঠিত, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ষোড়শ স্থানে নেমে গেছে। মেয়েদের সাক্ষরতায় কেরালা প্রথম স্থানে (শতকরা সাক্ষরতা ৬৪)। ১৯৮১ সালে মেয়েদের সাক্ষরতায় পশ্চিমবঙ্গ সপ্তদশ স্থানে (শতকরা সাক্ষরতা ৩০)। এই ভয়াবহ দ্রুত অবতরণের শেষ কোথায়?

এই গেলো সাক্ষরতার মোটা হিসাব। এখন দেখা যাক পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সালে প্রাথমিক, জুনিয়র বেসিক বা মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের পরিমাণে কতখানি উন্নতি হয়েছে। ১৯৬১ তে শতকরা কত লোক এই পরীক্ষা পাশ করেন এবং ১৯৭১ এই বা কত তার হিসাবে ২য় সারণিতে পাই

সারণি ২

শতকরা পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রাথমিক বা জুনিয়র বেসিক পাশ ১৯৬১-৭১

জেলা বা রাজ্য	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
দার্জিলিং	১১.২	৪.৭	২২.৫	১৩.৪
জলপাইগুড়ি	৮.৬	৪.১	১৭.৯	৮.৪
কুচবিহার	১০.৯	৩.১	১৭.৫	৭.৩
পশ্চিমদিনাজপুর	৮.৪	২.৬	১৮.০	৭.১
মালদহ	৯.১	২.৪	১৪.৭	৪.৮
পশ্চিমবঙ্গ	১৩.০	৫.৪	২২.৯	১২.৬
কেরালা	১৩.৯	১০.০	৩৯.৩	৩২.১
তামিলনাড়ু	১০.১	৫.০	২৬.৮	১৩.৭
মহারাষ্ট্র	১৮.৪	৬.৭	২৯.৭	১৪.৬
ভারত	১০.০	৩.৮	২১.১	১০.১

১৯৭১ সালে সারা ভারতে শতকরা ২১ জন পুরুষ এবং ১০ জন নারী প্রাথমিক পাশ ছিল। তার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭১ সালে ২৩ জন পুরুষ ও ১৩ জন নারী। মহারাষ্ট্রে ৩০ জন পুরুষ ও ১৫ জন নারী, তামিলনাড়ুতে ২৭ ও ১৪, কিন্তু কেরালায় ৪০ জন পুরুষ ও ৩২ জন নারী। সেই তুলনায় উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং-এ ২৩ জন পুরুষ ও ১৩ জন নারী, জলপাইগুড়িতে ১৮ জন পুরুষ ও ৮ জন নারী, কুচবিহারে ১৮ জন পুরুষ ও ৭ জন নারী, পশ্চিমদিনাজপুরে ১৮

জন পুরুষ ও ৭ জন নারী, মালদহে ১৫ জন পুরুষ ও ৫জন নারী। এক দশকে অবশ্য কিছুটা উন্নতি হয়। বস্তুত ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সালে প্রায় প্রতি জেলাতেই হারের বৃদ্ধি হয়েছে অল্পবিস্তর দুই গুন। কিন্তু ১৯৬১ সালে হারের হিসাব এতই অল্প ছিল, যে দশবছরে দ্বিগুণ হলেও আত্ম প্রসাদের কোন স্থান নেই, বিশেষ করে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ যখন এত দ্রুত পিছিয়ে পড়ছে।

আরও একটি শঙ্কার কারণ আছে। ১৯৭৭ সালে ন্যাশনাল স্যাম্পল্ সার্ভের ৩২ নং রাউন্ডে দেখা গেছে যে ১৫ - ৫৯ বছর বয়স্ক জনসংখ্যার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীর, ১৯৬১ সালের সেন্সাসের তুলনায় ১৯৭১ সালের সেন্সাসে আশা প্রদভাবে বাড়ে, কিন্তু ১৯৭৭ সালে পুনরায় বেশ স্পষ্ট ভাবে কমে যায়। ১৯৮১ সালের সেন্সাসে এই ক্রম অবনতির প্রমাণ স্পষ্ট। নীচের সারণিতে ১৯৬১ - ৭৭ এর হিসাব দেয়া হল।

সারণি ৩

পশ্চিমবঙ্গে ১৫ - ৫৯ বছর বয়স্ক পুরুষ নারীদের মধ্যে যারা নিজেদের ছাত্র-ছাত্রী বলে অভিহিত করেছেন তাঁদের লোকসংখ্যার শতকরা হারের হিসাব (১৯৬১ - ৭১ - ৭৭)

পশ্চিমবঙ্গ		পুরুষ		নারী
সাল	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর
১৯৬১	৪.২৩	৮.১৯	০.৯৪	৮.৫৩
১৯৭১	৬.৬০	১২.৯৫	৩.০২	১১.৬১
১৯৭৭	৫.৫২	৯.৪৪	২.০৯	৮.২৬

এই সারণিতে দেখি ১৯৬১ - ৭১ দশকে প্রাথমিক পাশে যেটুকু বা অগ্রগতি ছিল ১৯৭৭ সালে তা অনেকাংশে স্তিমিত হয়ে গেছে।

(৩)

সাক্ষরতা অথবা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যার্জনের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের এই আপাত স্থানু অবস্থা এমন কি অ বনতির কারণ এক কথায় বোঝা বা বোঝানো মুস্কিল। অবশ্য সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে বয়সের স্তরে স্তরে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে যতখানি অবনতি বা স্থানুত্বের কথা আমরা ভাবছি অবস্থা হয়ত ততটা খারাপ নয়। কিন্তু সংখ্যাগুলি নানাভাবে নাড়াচাড়া করে যেটুকু উন্নতি প্রমাণ করা সম্ভব তা কথায় যাকে বলে শালগ্রামের ওঠা বসা। মোটা সত্যটি থেকেই যায় যে পশ্চিমবঙ্গে নিরক্ষর জনসংখ্যা সাক্ষর জনসংখ্যার চেয়ে অনেক দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। অথচ শিক্ষা বিস্তারের কতগুলি মোটা মানদন্ডে অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে

র এরকম দুরূপযোগের সঙ্গত কারণ খুব নেই। ছাত্রপিছু ব্যয়ের অঙ্ক পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্যান্য অনেক রাজ্যের চেয়ে বেশী করেন। যদি শিক্ষক-ছাত্র হারাহার পরীক্ষা করি তাহলে দেখবো পশ্চিমবঙ্গে সেই হারাহার শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ঠ অনুকূল। নীচের সারণি দেখলেই তা পরিষ্কার হবে।

সারণি ৪

শিক্ষক পিছু গড় ছাত্রসংখ্যা ১৯৭২

ভারত ও বিশেষ কয়েকটি রাজ্য

রাজ্য	*প্রাক্ প্রাইমারী*	*প্রাইমারী*	*মাধ্যমিক*	*উচ্চবিদ্যালয়*
অন্ধ্র	৪৪	৪০	৩০	১৯
আসাম	২৬	৪২	২৪	২৪
বিহার	২২	৩৭	৩৩	২৮
গুজরাট	৪৩	৩৭	৩৬	২৮
হরিয়ানা	৩৫	৩৪	২৪	৩১
কর্ণাটক	৩৯	৪১	৪০	২২
কেরালা	৩১	৩৮	৩৩	২৭
মধ্য প্রদেশ	৩৪	৪২	২৭	২২
মহারাষ্ট্র	৩৩	৩৪	৩৩	২৫
পাঞ্জাব	২৭	৩৭	৩০	৩০
রাজস্থান	২৭	৩২	২৫	২১
তামিলনাড়ু	৩৩	৩৫	৩২	২৩
উত্তর প্রদেশ	২৪	৫২	২৭	২৭
পশ্চিমবঙ্গ	২৫	৩৫	২৯	২৮
ভারত	৩৬	৩৯	৩১	২৫

এই সারণিতে দেখি ভারতের প্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে প্রাথমিক মানে শিক্ষকপিছু গড় ছাত্রসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের থেকে শুধু মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও হরিয়ানায় অনুকূল। মাধ্যমিক মানে পশ্চিমবঙ্গ কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় বরং পিছিয়ে আছে। অপর পক্ষে উচ্চবিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গের হিসাব যথেষ্ঠ অনুকূল।

নীচে পঞ্চম সারণিতে দেখি হাজারকরা ছাত্রপিছু বিদ্যালয়ের ভৌগোলিক অবস্থিতি অন্য অনেক রাজ্যের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গে অনেক বেশী অনুকূল। সুতরাং বিদ্যালয়ের অভাব এই অজুহাতও পশ্চিমবঙ্গে খাটে না।

সারণি ৫

গড়ে কত বর্গ কিলোমিটারে একটি প্রাথমিক স্কুল ১৯৭১

রাজ্য	গ্রাম	শহর
বিহার	৩.৫৮	১.০৬
কেরালা	৫.৩৫	১.৭২
মহারাষ্ট্র	১১.০৩	১.৬৪
পাঞ্জাব	৫.৭৭	০.৮৪
তামিলনাড়ু	৫.৪৯	১.৪১
উত্তর প্রদেশ	৫.৩৪	০.৪৬
পশ্চিমবঙ্গ	২.৫৩	০.৩৮

পশ্চিমবঙ্গে স্কুলগুলি অনেক দূরে দূরে অবস্থিত, যার ফলে স্কুলে শিশুদের অথবা ছোট ছেলেমেয়েদের হেটে যেতে কষ্ট হয়, সে অজুহাত ঠিক চলে না। কি গ্রামে কি শহরে বড় বড় রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে স্কুলগুলি গড় পড়তা হিসাবে ছাত্রদের বাড়ীর সবচেয়ে কাছে। গ্রামাঞ্চলে এক কিলোমিটারের মধ্যে এবং এক তৃতীয়াংশ কিলোমিটারের মধ্যে।

(৪)

তবে কি পশ্চিমবঙ্গে শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের গৃহকর্মে ও গৃহের বাইরে উপার্জননির্ভর কাজে অন্য রাজ্য অপেক্ষায় বেশী কাটাতে হয়, যা নাকি তাদের স্কুলে পড়ার পথে অন্য রাজ্যের তুলনায় বেশী অন্তরায় হয়?

যারা সর্বহারা বা প্রোলেটারিয়েট কথার উচ্চারণ মাত্র উৎকণ্ঠিত বা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন তাঁরাও স্বীকার করবেন, অন্য কোন শ্রেনী এই সংজ্ঞা পড়ুন বা না পড়ুন, আমাদের দেশের শিশুরা বা অল্পবয়স্ক মেহনতী কর্মিরা এবং মেহনতী নারী কর্মিদের অধিকাংশ এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ বা কেরল রাজ্য ছাড়া অধিকাংশ রাজ্যেই ন্যূনতম কৃষিমজুরী বা অন্যান্য দিনমজুরীর যে দর আইনানুসারে জারি হয়, নারী কর্মিরা সর্বদা তার অনেক কম পান। অপ্রাপ্ত বয়স্করা তারও কম। সাধারণত মেয়েরা পুরুষ কর্মিদের প্রায় অর্ধেক হারে দিনমজুরী পায় এবং অপ্রাপ্তবয়স্করা এক তৃতীয়াংশ বা তারও কম হারে। অথচ নারীদের দিয়ে সাধারণত অনক বেশীক্ষণ খাটিয়ে নেয়া হয়, বেগার দেওয়ানো হয় এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের ঘাড়ে বহুবিধ বেগার কাজ চাপিয়ে দেওয়া হয়।

ন্যাশন্যাল স্যাম্পল্ সার্ভের ২৫ রাউন্ড (১৯৭০-৭১) থেকে আহৃত নিচের সারণিটি দেখা যাক ঃ

সারণি ৬

কৃষিমজুরীতে বয়সানুসারে গ্রামাঞ্চলের কর্মিদের দৈনিক উপার্জ্জন ১৯৭১ (টাকা)

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে ও প্রাপ্তবয়স্ক নারী

রাজ্য	বয়স					
	০—৯	১০—১৪	১৫—৪৪	৪৫—৪৯	৫০+	
অন্ধ্র	০.৬০	১.৩৩	১.৭৪	১.৮৭	১.৪৬	
আসাম		০.৮৬	১.৯৮	৩.৫২	৩.৪৩	৩.৫৮
বিহার		১.৭২	১.৭৬	২.১১	২.১২	২.০৮
গুজরাট		০.৭৯	০.৮৫	১.৬৬	১.৭৩	১.৫৮
হরিয়ানা		—	২.২৮	৩.৮৩	৩.৮১	—
কেরালা		—	১.৫৩	২.৮৯	৩.১৬	৩.৪৪
মহারাষ্ট্র		০.৮০	১.০৭	১.৮০	১.৮৪	১.৪৩
তামিলনাড়ু	১.০৭	০.৮৯	১.৭৯	২.০০	১.৮৩	
উত্তর প্রদেশ	১.২৩	১.২১	১.৯৯	২.০৭	১.৭৩	

পশ্চিমবঙ্গের দৈনিক হার এই সারণিতে নেই তবে সাধারণত পশ্চিমবঙ্গে কৃষিমজুরির দৈনিক দর প্রায় অন্ধ্র বা মহারাষ্ট্রের সামিল। সাধারণত উপার্জন কত কম সারণিটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। আরেকটি লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে অনেক রাজ্য ৯ বছরেরও কম ছেলেমেয়েরা ১০-১৪ বয়সের ছেলেমেয়ে অপেক্ষায় বেশী মজুরী পায়। তার কারণ হয়ত ৯ বছরের কম ছেলেমেয়েরা আরও অসহায় এবং বাধ্য হয়।

গত কয়েক বছর ধরে আমার সহকর্মিদের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে কিছু গবেষণা করেছি। আমার ছাত্র প্রধান নাঙ্গিয়া এই সারণিটি প্রস্তুত করেছেন।

সারণি ৭

ভারতে এবং কয়েকটি রাজ্য অ প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে এবং অ প্রাপ্তবয়স্ক কর্মিদের মোট সংখ্যা ১৯৭১

রাজ্য	০-১৪ বয়স্ক মোট সংখ্যা (হাজার)	০-১৪ বয়স্ক পিতৃমাতৃহীন অনাথের সংখ্যা (হাজার)	০-১৪বয়স্ক জনসংখ্যার কর্মিদের সংখ্যা (হাজার)	তুলনায় কর্মি সংখ্যার শতকরা হার
ভারত	২৩০,২৫৪	৩৩৩.৩	১০,৭৫৪	৪.৬৬
বিহার	২৩,৯৯৪	৪৫.৬	১,০৫৯	৪.৪২
কেরালা	৮,৫৯৫	৩.০	১১২	১.০৩
মহারাষ্ট্র	২০,৮৪৩	৫.৪	২৩৩	৪.১৬
তামিলনাড়ু	১৫,৫৬২	২৫.৫	৭১৩	৪.৫৮
উত্তর প্রদেশ	৩৬,৯৬৫	৭৭.০	১,৩২৭	৩.৫৯
পশ্চিমবঙ্গ	১৯,০০৮	২১.৯	৫১১	২.৬৯

সারণিটিতে দুটি জিনিষ লক্ষ্য করার মত। সারা ভারতের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে অ প্রাপ্তবয়স্করা অনেক কম হারে কাজে নিযক্ত হয়, অন্তত কাজে নিযুক্ত বলে লেখানো হয়। সেই অনুপাতে বিহারে, মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে, তামিলনাড়ুতে বা উত্তর প্রদেশে অনেক বেশী হারে ছোট ছেলেমেয়েরা রোজগারের জন্য গৃহের বাইরে মজুরি নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গেও প্রায় শতকরা তিনজন অ প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে সংসার নির্বাহের জন্য উপার্জন করতে বাধ্য হয়। সবচেয়ে কম অনুপাতে কাজ করতে যায় কেরালায়। কেরালায় কিন্তু এই বয়সে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়াশোনায় ব্যাপৃত থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে অতি অবশ্যই শিশু, অ প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের এবং নারীদের অন্যায্য রকম বেশী খাটানো হয়। এ যে শুধু পশ্চিমবঙ্গে বা সারা ভারতেই হয় তা নয়, পৃথিবীর সবদেশেই হয়, বিশেষত আফ্রিকায়, ল্যাটিন আমেরিকায়। বেশী কিছু দূরে যেতে হবে না; এই শিলিগুড়ি বা বাগডোগরার যে-কোন রাস্তা বা গলি বা মেরামতি দোকানের দিকে চেয়ে দেখুন, দেখবেন অধিকাংশ ভারী এবং নোংরা মেহনতি কাজ ছোট ছেলেমেয়েদের দিয়ে অথবা নারীদের দিয়ে করানো হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এটাত তবে দেশের চলতি রেওয়াজ। তামিলনাড়ুতেও হয়, মহারাষ্ট্রেও হয়। অথচ ওসব রাজ্যে সাক্ষরতা কি করে বাড়ছে?

(৫)

সংখ্যাতত্ত্বে অধিক জীবন কাটিয়ে সংখ্যাতত্ত্বকে উড়িয়ে দিতে বাধে, যদিও আমি সর্বদা মানতে রাজী যে সংসারে অনেক কিছু আছে যা সংক্যাতত্ত্বে আদৌ ধরা পড়ে না, অথবা ভুলভাবে

প্রতিফলিত হয়।

যে কয়টি প্রসঙ্গ আলোচনা করলুম তাতে এইটুকু প্রতীতি হয় যে পশ্চিমবঙ্গে এত পরিমাণ নিরক্ষরতার কারণ এ রাজ্যের শিক্ষার বিধিব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া দুষ্কর। পশ্চিমবঙ্গ এ ব্যাপারে ১৯৬০ সালের পর আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা গভীর বলে আমি কোনমতেই দাবী করতে পারি না, সুতরাং এই অপর্য্যাপ্তির সংখ্যাতত্ত্ব সম্মত কারণ আমি খুঁজে পাইনা। যদি চল্লিশ দশকের কথা হ'ত তাহলে বলতে পারতুম ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, অপুষ্টি প্রভৃতি কারণে শিশুরা বা কিশোররা স্কুলে নিয়মিত যেতে পারে না। কিন্তু সত্তর দশকে সে নজীর চলে না। চল্লিশ দশকের তুলনায় দারিদ্রের চাপ আপতদৃষ্টিতে যে খুব বেড়েছে তাও বলা যায় না। কারণ যাঁদের বয়স আজ পঞ্চাশের বেশী তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের যে-কোন স্থানের কথাই মনে করলে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে আজকের দৈন্যের সঙ্গে চল্লিশ বছর আগেকার দৈন্যের ঠিক তুলনা হয় না। তবে একটা বড় কথা আমরা মনে রাখি না যে মূল্যস্ফীতি, দুস্প্রাপ্যতা, যোগ্য কর্মসংস্থানের অভাবে আজ প্রত্যেকে যতখানি পরিশ্রম করতে হয় বা একাধিক কাজে নিযুক্ত থেকে গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করতে হয় চল্লিশ বছর আগে তার প্রয়োজন হত না। অপরপক্ষে অনেক কিছু অভাব ও দারিদ্র্যতা সত্ত্বেও জীবনযাত্রার মান কিছুটা বেড়েছে। উপার্জ্জনের নিম্নতম বিশ দশমাংশ যদি বাদ দেন তবে উর্ধতন আশি দশমাংশে বসনভূষণ আহার বিহারের ছন্দে এ সত্য বেশ স্পষ্ট। এও সম্ভব যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাভরসা চলে যাওয়ায় আমরা বর্তমানকে আরও বেশী আঁকড়ে ধরেছি, এবং বর্তমানে বেঁচে থাকার আগ্রহে আগের থেকে অধিক পরিশ্রম করে যেটুকু উপার্জন করি সেটুকু স্বস্ব মানে বেঁচে থাকার চেষ্টায় খরচ করি।

আমার ব্যক্তিগত মতে পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার শ্লথগতির আরও দুটি প্রধান কারণের উল্লেখ করা আমি বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। একটি কারণ বিশেষ করে আমার নিজের পেশাকে অর্থাৎ শিক্ষকতাকে আঘাত করবে। দ্বিতীয় কারণ হল যে শিক্ষা আমরা বিতরণ করি তার উদ্দেশ্য, বিষয়, প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষা প্রণালীগত।

প্রথম কারণটি আমি নিজে শিক্ষক বলে জোর দিয়ে বলার সাহস পাচ্ছি। আমরা শিক্ষকরা যদি আজ মুক্ত কণ্ঠে নিজদোষ স্বীকার করে তার সংশোধনের প্রয়াস না করি তাহলে আমার আশংকা হয় দেশ থেকে অচিরে শিক্ষা অন্তর্হিত হবে। গত বিশ বাইশ বছরে ভারতের ৩৫০টির উপর জেলার মধ্যে অন্তত ৩০০টি জেলায় ঘুরে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, যে-সব রাজ্যে শিক্ষকরা তাঁদের পারিপার্শ্বিক সমাজের কাছে দায়ী বোধ করেন না, বা সেই সমাজকে উপেক্ষা করার জোর বা সাহস পান সেই সব রাজ্যের শিক্ষকরা স্বাধিকার প্রমত্ততা বশে তাঁদের কর্তব্যে অবহেলা করে দ্রুত শিক্ষায় নৈরাজ্য আনছেন। এখনও পর্যন্ত শিক্ষকরা কেরালায় বা তামিলনাড়ুতে, মহারাষ্ট্রে বা পাঞ্জাবে স্থানীয় গ্রামীন সমাজের আধিপত্য সহজে স্বীকার করেন এবং সেই সমাজের পঞ্চায়েতের স্বার্থের বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজ খুসীমত চলার কথা ভাবেন না।

কিন্তু উত্তর প্রদেশে, বিহারে, পশ্চিমবঙ্গে এবং আরও কয়েকটি রাজ্যে শিক্ষকদের এই সামাজিক দায়িত্ববোধ বেশ শিথিল বলে মনে হয়। দুঃখের বিষয় এই যে কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণে, কোন ক্ষেত্রে বা প্রশাসনিক কারণে এই মনোভাব ক্রমশঃ প্রশ্রয় পাচ্ছে।

প্রথমত রাজ্যের রাজাদের রাজনীতি খেলায় শিক্ষকগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে ক্রীড়নকে রূপান্তরিত করার রেওয়াজ আজ ব্যাপক। রাজনৈতিক দলকে সমর্থনের বিনিময়ে বহু শিক্ষক-গোষ্ঠী শিক্ষকতার নৈতিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি আদায় করেন। এই নৈতিক দায়িত্বহীনতার ফলে তাঁরা ছাত্রদের চোখে হীন প্রতি পন্ন হন। সময়ে সময়ে তাঁরা ছাত্রদের উস্‌কিয়ে দিয়ে বা দলে টেনে দলের এমন কি নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থ হাঁসিল করেন।

দ্বিতীয়ত, দূরাঞ্চল থেকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষক আমদানির অজুহাতে তথাকথিত শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষকের আমদানি ও নিয়োগের কুফল আমরা প্রায়ই দেখি। আমদানি করা শিক্ষক শ্রেণী তাঁদের একচেটিয়াত্বের সুযোগ নিয়ে স্ব স্ব কর্মস্থানে প্রায়ই বাস করেন না, ছাত্রদের প্রতি দায়িত্বজ্ঞান রহিত হন, অনেক সময়ে স্কুলে এমন কি গ্রামেও অনুপস্থিত থাকেন, গ্রামের নেতৃবর্গকে অক্লেশে উপেক্ষা করনে, অথচ রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকত্বর কৃপায় পুরো বেতন ভোগ করেন। তৃতীয়ত, ছাত্র ও শিক্ষকের পরস্পর সম্বন্ধে শৈথিল্য আসায় ব্যাপক আকারে উৎকোচ গ্রহণও অনেক স্থানে আজ প্রচলিত। চতুর্থত, দেশের আজ এমন অবস্থা যে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষকরাও যে বেতন পান তাতে দেশের ব্যক্তিগত গড় আয়ের মানে তাঁরা ঊর্ধতন পঁচিশ বা ত্রিশ দশমিকের মধ্যে অনায়াসে পড়েন। এবং যেহেতু আমাদের দেশের গরীবমাত্রেই ছোটলোক এবং মাসমাইনে পাওয়া ব্যক্তি মাত্রেই মধ্যবিত্ত বা বড়লোক, সেহেতু গরীব ছাত্রদের প্রতি— যাঁরা ছাত্র সমাজের অন্তত সত্তর ভাগ — তাঁদের প্রতি শিক্ষকদের স্বভাবতই কারণে অকারণে অসীম অবজ্ঞা ও অবহেলার মনোভাব প্রকাশে কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না। তদুপরি নীচু জাতির প্রতি উঁচু জাতির অত্যাচারের ব্যাপার ত্রে আছেই, যা আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও নিতান্ত কম নয়। পঞ্চমত, যে সব ছেলে-মেয়েরা মেহনৎ করে সংসার পালনে সাহায্য করে তাদের প্রতি আমাদের তাচ্ছিল্য এমন কি বৈরীভাবও কিছু কম নয়। ষষ্ঠত, আজ অবধি আমাদের স্কুলের বড় ছুটিগুলি সাহেবিমতে গ্রীষ্মকালেই দেয়া হয়। জমিতে বীজবুনন অথবা ফসল কাটা বা তোলার সময়ে নয়, ফলে অধিকাংশ মেহনতী ছেলেমেয়ে স্কুল কামাই করতে বাধ্য হয়। একবার মাসাধিককাল স্কুল কামাই হলে অধিকাংশ ছেলেমেয়ের পক্ষে স্কুল বা ক্লাস ত্যাগ করা ব্যতীত গতি থাকে না। এই সব কারণে আমাদের বা অনুরূপ রাজ্যে সরকারের তরফ থেকে অনেক খরচ এবং অনুকুল অবস্থা সৃষ্টি সত্বেও সাক্ষরতা বা শিক্ষা এগোচ্ছে না। সবশেষে বড় প্রশ্ন হল, যে সব বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয় এবং সেগুলি যে-ভাবে শেখানো হয় তা দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনে কোন কাজেই লাগেনা, ফলে ছেলেমেয়েরা সে-সব জিনিষ শেখার উৎসাহ পায় না। স্কুলের অধিকাংশ পাঠ্য বিষয় তাদের জীবন থেকে এত দূরে যে তারা পৃথিবীতে বাস না করে যেন মঙ্গলগ্রহে বাস করছে ধরা হয়। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। সম্প্রতি ইন্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের

ডাঃ বি,এন, সরকার এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কিছুদিন ধরে নিম্নবিত্ত ও নিম্নজাতির মা বাবারা যতটুকুবা শিক্ষা পেয়েছেন অনেক সময় তাঁদের ছেলেমেয়েদের তাঁরা সেটুকু শিক্ষার জন্য পাঠাতেও নারাজ। তাঁদের একই উত্তর ঃ শিখিয়ে কি হবে? না পাবে ভাল কাজ, না বাড়বে বোধ বা চিন্তাশক্তি। উল্টে জাতব্যবসাও ভুলে যাবে বা ঘৃণা করবে। মাথায় নানারকম উৎকট ধারনা ঢুকবে, বাবুয়ানি শিখবে যার খরচ জোগানো বাপমায়ের পক্ষে সম্ভব নয়।

(৬)

আমাদের লেখকদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে গভীরভাবে নারীচরিত্র কলমে তুলে ধরেছেন তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি নারীচরিত্র এবং রবীন্দ্রনাথের দামিণী বা বিনোদিণী ব্যতীত শরৎচন্দ্রে যে সব নারীচরিত্র আমরা পাই তা বহু সাহিত্যেই বিরল। ১৯১৩ সালে, অর্থাৎ মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যে মধ্যাহ্ন সূর্যের তেজে যখন বিরাজমান তখন যমুনা পত্রিকায় নারীর মূল্য নামে তাঁর একটি বৃহৎ প্রবন্ধ পাঁচ সংখ্যায় প্রকাশিত। প্রগাঢ় গবেষণায়, লেখার মাধুর্যে, সমবেদনায়, গভীর দৃষ্টিকোণে এবং পান্ডিত্যে আমার মতে লেখাটি এমন কি জন ষ্টুয়ার্ট মিলের অন দি সাবজেক্‌শন্ অভ উইমেন নামে জগদ্বিখ্যাত প্রবন্ধের থেকেও উৎকৃস্ট, হৃদয়গ্রাহী ও গভীর। নারীর মুল্যে শরৎচন্দ্র একজায়গায় লিখেছেন ঃ

আরো একটা কথা। সামাজিক নিয়ম সম্বন্ধে যাঁহারাই আলোচন করিয়া তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এ সত্যটাও আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন যে, সমাজে নারীর স্থান অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের স্থান আপনি নামিয়া আসে। কেন হয়, এবং হওয়াটা স্বাভাবিক কিনা, একথা বুঝিতে পারা কঠিন নহে। আমিও ইতি পুর্ব কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছি, শিশুর জননীর সহিত যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পিতার সহিত তত নয়। ... কিন্তু এই মায়ের অবস্থাটা সাধারণতঃ যদি দিন দিন নামিয়া পড়িতে থাকে, এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলে দেশের কৃতী সন্তানের সংখ্যা কমিয়া আসিতেই থাকে, এই প্রতিযোগিতার দিনে সে জাতি, আর জাতির মত জাতি হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তবে এতকাল টিকিয়া রহিল কিরূপে? এই বলিয়া জবাবদিহি করিতে যাঁহারা চান তাঁহাদের শুধু এইটুকু মাত্রই বলিতে চাই যে, কোনমতে কেবল প্রাণ ধারণ করিয়া থাকাটাই মানুষের বাঁচা নয়।

এ হেন ক্ষেত্রে মেয়েদের বা মায়েদের অবস্থা পার্থক্যের সৃষ্টি করতে পারে, যদি তাঁরা উপার্জনশীল হন এবং ছেলেমেয়েদের পড়ানোর খরচ কিছুটা বহন করেন। কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে এবং অন্য অনেক রাজ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা আজ প্রায় ৭০/৮০ বছর ধরে দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৫১ সালের পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাস রিপোর্ট আমি এ বিষয়ে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করি, যেমন নিম্নলিখিত পেশা গুলিতে মেয়ে শ্রমিকের সংখ্যা ১৯০১ সালে যা ছিল ১৯৫১ সালে তার অনেকগুলিতে অর্ধেক বা তারও কমে নেমে গেছে ঃ

১। কৃষি ব্যতীত প্রাথমিক শিল্পাদি
২। পশু পালন
৩। ছোট পশু এবং কীট পতঙ্গ পালন
৪। চা বাগান প্রভৃতিতে কাজ
৫। মাছ ধরা এবং মাছবিক্রি ব্যবসা (মেছুনী)
৬। খাদ্যদ্রব্য, সূতা ও কাপড় বোনা, চর্মশিল্প
৭। ভেষজ তেল এবং গব্যাদি দ্রব্য (তেলেনী বা গয়লানী)
৮। নানা প্রকার খুচরা বিক্রয়
৯। রাস্তা তৈরী বা মেরামতি কাজ
১০। গৃহপরিচারিকার কাজ
১১। নাপিতানী বা অন্যান্য অঙ্গচর্য্যার কাজ
১২। ধোবানীর কাজ
১৩। যাজকতার কাজ ইত্যাদি

সম্প্রতি আমার দুজন সহকর্মী ও আমি ১৯৬১ এবং ১৯৭১ এর সেন্সাসের ফলাফল নিয়ে এ বিষয় আরো গবেষণা করেছি। তাতে দেখা গেছে গত দুই তিন দশকে নারী কর্মীদের সংখ্যা আরো হ্রাস ত পেয়েছেই উপরন্তু আরও নতুন কয়েক ধরণের কাজে নারীরা পিছু হটে গেছেন।

অন্যদিকে আবার অন্য কয়েক ধরণের কাজে নারীদের কর্মসংস্থান বেশ বেড়ে গেছে, যেমন ঃ
১। ধাতু, রাসায়ণিক পদার্থ, শিল্প বা কারখানার কাজ
২। কাগজ ও কাগজ দ্রব্য শিল্প
৩। ছাপাখানা প্রভৃতি শিল্প
৪। খুচরা বিক্রয়
৫। রেলওয়ে
৬। শিক্ষকতা
৭। নার্স, ডাক্তারি, জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবসায়
৮। হোটেল, রেস্তোঁরা প্রভৃতি
৯। মধ্য শ্রেণী বা উচ্চশ্রেণী সরকারী, বেসরকারী দপ্তরের নানাবিধ সাধারণ, বিশেষ বা বৈজ্ঞানিক কাজ

মেহনতী নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন পরিবারের সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ আছে, চাষীই হোন, বা কৃষি মজুর, কারিগর হোন, তাঁদের নিশ্চয় জানা আছে যে, অ প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের

ভরণপোষণের এবং মানুষ করার ভার অধিকাংশ মেয়েদের উপরে পড়ে। বহু সংসারে দেখছি স্বামী অনেক দিন বেকার, অথচ তার কল্পিত মর্যাদার নীচে কাজ করে সংসার প্রতি পালন কিছুতেই করতে রাজী নয়। সেই ক্ষেত্রে স্ত্রী বা মেয়ে সব মর্যাদা জলাঞ্জলী দিয়ে যতদূর নামা যায় নেমে উপার্জন করে শিশু বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের বা ভাইবোনের মুখে দুটি অন্নের ব্যবস্থা করেন। কলকাতায় এমন অসংখ্য সংসার আছে যেখানে বোন নিজে খেটে ভাইদের স্কুলে বা কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থা করেছে। ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' কিছু কাল্পনিক উপাখ্যান নয়। সেক্ষেত্রে, বিত্তহীন বা নিম্নবিত্ত দিন মজুর, কারিগর বা অফিসে দপ্তরে সাধারণ কাজ করা মেয়েদের সংখ্যা, বেতন এবং উপার্জনের সুযোগ যদি ক্রমশ কমে যায় তাহলে দেশের শতকরা ৭৫ জন শিশু বা অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিদ্যার্জনের সুযোগ নষ্ট হবে। আজ তাই নারীদের নানাবিধ উপার্জনের অনুকূল শিক্ষা বা কারিগরি বিদ্যাধিকার করা নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শেলাই, ফোঁড়াই, এমব্রয়ডারি জাতীয় ঘরোয়া বা পোশাকী শিক্ষার কথা আমি বলছি না। কারণ নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারে এ ধরণের শিক্ষা আজ নিতান্ত অবান্তর হয়ে উঠেছে। নক্সা, এমব্রয়ডারি করা জামা কাপড় কিনবে কয় জন? পরবে কারা? ব্যবস্থা করা উচিত সেই ধরণের শিক্ষার যাতে করে বিত্তহীন বা নিম্নবিত্ত মেয়েদের উপার্জন ক্ষমতায় এবং নিয়োগযোগ্যতা বাড়ে, বিশেষ করে উন্নত ধরণের কৃষি কাজে, কলকারখানায়, শিল্প, যানবাহন ক্ষেত্রে ইত্যাদিতে।

(৭)

ভারতবর্ষের বহু স্থানে ঘুরে আমার এই প্রতীতি হয়েছে যে, যে সব স্থানে অত পশীলী হিন্দু বা মুসলমান সমাজ সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতি সমাজে যেখানে এই দুই সমাজ বিশেষ প্রতিপত্তি বা আধিপত্যশালী সেখানে তথাকথিত নীচজাতি বা বিত্তহীন অথবা নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতে দ্রুত অগ্রসর হওয়া দুষ্কর। আর্থিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, ব্যবহারিক, সামাজিক, ভূমিব্যবস্থাজনিত যাবতীয় রাষ্ট্রিক ক্ষমতা ও অত্যাচার প্রয়োগের শক্তি এই দুই সম্প্রদায়ের এতখানি কুক্ষিগত যে তাঁরা অধস্তন সকলকে দাস সমাজে পরিণত করেছেন এবং তাদের হাতে প্রাথমিক শিক্ষার সোণার চাবি কাঠি তুলে দিতে একান্ত নারাজ। আমার মতে প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতার মধ্যে যতখানি ব্যবধান সে ব্যবধান পি-এইচ-ডি এবং মাধ্যমিক পাশ কিশোরের ব্যবধানের চেয়েও বেশী। এ সত্যটি অত পশীলী বা মধ্য এবং উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়গুলি খুবই ভাল জানেন।

১৯৪৮ সালে অর্থাৎ বত্রিশ বছর আগে আমি মালদহ জেলায় কিছুকাল কাজ করেছিলাম। গাজোল, বামনগোলা, হবিপুর থানায় মাসাধিককাল আমার স্ত্রী ও আমি তাঁবু নিয়ে নানাস্থানে ঘুরে সদরে ফিরে ককেজন রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয়দের আহ্বান করে জেলায়, বিশেষ করে যে সব থানায় ঘুরে এসেছি সে সব থানায় সাঁওতাল বাসিন্দাদের বুদ্ধি, পরিশ্রম ও কর্মকুশলতার প্রশংসা করে বিশেষ আবেদন করি তাঁরা যেন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অচিরে চালু করেন এবং

প্রাথমিক বিদ্যা প্রসারের প্রতি জোর দেন। মাস আষ্টেক গত হ'ল, কিছুই এগোলো না, আমার প্রস্থানের সময় আগত প্রায়। আবার তাঁদের আমন্ত্রণ করে প্রসঙ্গটির উত্থাপন করলুম। তার সঙ্গে বল্লুম তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গে বা কেরালায় যেখানে যেখানে সাক্ষরতা বেশী সেখানে জনসাধাররের ভোটদানে খুব সঙ্গতি থাকে। প্রথমত তারা রাজনৈতিক দলকেই বেশী ভোট দেয়, উপরন্তু আজ এ-পার্টি কাল ও পার্টি, আজ ওমুককে কাল তমুককে ভোট দিয়ে অযথা ভোট নষ্ট করেনা। ভদ্রলোকেরা শান্ত ভাবে শুনলেন, কোন জবাব দিলেন না। অনেক্ষণ পরে অন্যান্য কথার মধ্যে তাঁদের একজন নম্র ও মৃদুস্বরে বল্লেন, জানেন ছোটলোকদের লেকাপড়া শেখালে শুধু আমাদের কথায় আর ভোট দেবে না। অতঃপর সকলে আমার নিমন্ত্রন রক্ষা করে আতিথ্য রক্ষার পর অতি সৌজন্য সহকারে বিদায় নিলেন।

প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পাশ আমার মতে আমাদের দেশের লক্ষ্মণরেখা। এই লক্ষ্মণরেখা যাতে বিত্তহীন বা নিম্নবিত্তরা কিছুতেই না লঙ্ঘণ করে বা যত সম্ভব কম সংখ্যায় লঙ্ঘণ করে তার জন্য আমরা বদ্ধ পরিকর। একবার মাধ্যমিক পাশের গন্ডী অতিক্রম করতে পারলে সরাসরি এম,এ পর্যন্ত পৌঁছে যে কেউ মধ্যবিত্ত গোষ্ঠির মতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। মেহনতী কাজের বালাই নেই, লোকবল, অর্থবল দুইয়েরই আনুকূল্যে পরিপুষ্টিত হই, সকলে সকলকে চিনি, সকলেই রবীন্দ্রনাথের গান গাই, মৃণাল সেনের ছবি দেখে মুগ্ধ হই, মুক্তাঙ্গণে নিত্য নতুন নাটকে যাত্রায় পরম সন্তোষ লাভ করি। কিন্তু এ লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করা বা মুছে দেওয়া? নৈব নৈব চ। আমাদের ভাষায় তুই আর আপনির মধ্যে অনতিক্রম্য দূরত্ব। সমাজের ৭০ ভাগ তুই এবং ৩০ ভাগ আপনি। সাক্ষরতার হারাহারিও প্রায় সেখনে এসে দাঁড়িয়ে আর এগোতে চায় না, যতকিছুই করি না কেন।

(৮)

বক্তব্য দীর্ঘ হয়ে গেলো। আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটানো আমার উচিত নয়। প্রথমে যখন উপাচার্য শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় আমাকে লেখেন তখন ভেবেছিলুম ভাষা সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করবো। সেই উদ্দেশ্যে আঠারো শতক থেকে কিভাবে আমরা ইংরেজী গ্রহণ করেছি তার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনাগুলি আরেকবার পড়লুম। পুনরায় পড়লুম রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক রচনা সমূহ, শরৎচন্দ্রের স্বদেশ ও সাহিত্য, বিশেষ করে তার আশ্চর্য রচনা শিক্ষার বিরোধ। পড়েছি পুনরায় গান্ধীজীর কিছু কিছু রচনা, জাকির হোসেন সাহেবের প্রস্তাব, মহারাষ্ট্রের গ্রাম শিক্ষণ মহিমের মূলনীতি। কিন্তু লিখতে গিয়ে প্রবন্ধ হয়ে গেল অন্য বিষয়ে, কারণ ইতিমধ্যে জলঘোলা হয়ে গেছে। তবু শেষের কয়েকটি কথা ভাষার উপরেই বলব।

আমাদের বিশেষ ক্ষোভের বিষয়, দেশ স্বাধীন হবার পর দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরে আমরা না কেন্দ্রে, না রাজ্যে, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রমুখ দু একজন ছাড়া, এমন মন্ত্রী পেলুম না যাঁরা নাকি শিক্ষা বা স্বাস্থ্য দপ্তর নিয়ে পড়ে রইলেন, এবং যাঁরা অবিসংবাদিত ভাবে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র,

যাঁদের বাক্য ও হিতাহিত বিবেচনা আমরা সকলে একবাক্যে মেনে নিতে দ্বিধা করবোনা। জুলিয়াস নেয়ারের বা কেনেথ কোন্ডার মত আমর এমন একজন প্রধানমন্ত্রী পেলুম না যিনি সর্বদা দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতিকে চালনা করছেন। বস্তুত এই মন্ত্রী লাভের মাধ্যমে আমাদের খুবই কম সময়ে বিশ্বাস করার সুযোগ হয়েছে যে, শিক্ষ এবং স্বাস্থ্য জাতির চেতনা ও প্রাণস্বরূপ। এই দুটি দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে আমরা অধিকাংশ সময়েই দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নেতাকে পেয়েছি, যাদের না ছিল আত্ব প্রত্যয় বা দেশের হিতাহিত বোধ বা শাসন কৌশল। তদুকরি না কেন্দ্র না রাজ্যে এই দুটি দপ্তরের সচিব হিসাবেও আমরা প্রথম শ্রেণীর কর্মচারী সাধারণত পাইনি। দেশ আজ পর্যন্ত কেন গড়ে ওঠেনি তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটি নিশ্চয় একটি বড় কারণ।

আজ পর্যন্ত তিলক, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জাকির হোসেন প্রভৃতি মহামানবরা প্রাথমিক বা যে-কোন শিক্ষার ভাষা কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে যে-সব সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করে গেছেন, তাঁদের উপদেশ শিরোধার্য করা দূরে থাকুক, সরকারী মহলে তার প্রকৃত, ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্র পর্যন্ত কোনদিন প্রস্তুত হলো না।

ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষার বিষয়ে ছোট দুটি ঘটনার উল্লেখ করে আপনাদের ক্লান্তি কথঞ্চিৎ দূর করে আমার বক্তব্য শেষ করবো। আমার পরম সৌভাগ্য আমি শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ সেন, অপূর্ব কুমার চন্দ, হিরণ ব্যানার্জী, সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, হামফ্রি হাউস প্রভৃতির কাছে অনেক বছর ধরে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেছি, যাঁদের মত ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ভারতে কেন জগতে দুর্লভ। তাঁদের চেষ্টায় গর্দভ অবস্থা থেকে ঘোটকে পরিনত হয়ে কিছুদিন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। সেখানে ভাগ্যক্রমে আমি কলেজ ছাত্রাবাসে স্থান পেয়েছিলুম, ফলে সর্বদা ইংরেজ ছেলেমেয়ের সঙ্গে আহার বিহার, কথাবার্ত্ত বলার সুযোগ হত। বছরখানেক বাসের পর আমার বন্ধুরা আলাপছলে একদিন বিব্রতস্বরে বললেন, জানো অশোক, তুমি যখন প্রথম এলে তখন তোমার কথা আমরা প্রায় বুঝতেই পারতুম না, আনসাট ধরতুম। সাহিত্য শেখা আর দৈনন্দিন জীবনে সুষ্ঠভাবে ভাষা ব্যবহার পরতে পারা, দুইয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ।

শুধু যে আমরই হয়েছে তা নয়। আরেকটা গল্প বললে আপনারা পুরো পুরি বিশ্বাস করবেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু জগদ্বিখ্যাত পন্ডিত। তিনি অন্তত পাঁচটি ইউরোপীয় ভাষা খুব ভাল জানতেন, ইংরেজীর ত কথাই নেই। তাছাড়া সংস্কৃত, বাংলা, প্রাকৃত প্রভৃতি ত আছেই। ১৯৫৪ সালে আমাকে একদিন বললেন, জানো অশোক, ১৯৪৭ সালে আমি লন্ডনে একদিন রাতে হ্যামস্টেড হীথ থেকে ট্যাক্সি ধরে বাড়ী ফিরবো বলে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে গিয়েছি। ড্রাইভারকে বললুম কোথাও যেতে চাই। সে ড্রাইভার আরেকজনকে চেচিয়ে ডেকে বললো, ভাই এসো, এ ভদ্রলোক ফ্রেঞ্চ না কি বলছেন বুঝতে পারছি না, তুমি বুঝে আমাকে বোঝাও। দেখো, বহুদিন বিলেতে ছিলুম। ইংরেজী জানি বলে একটা অহঙ্কারও ছিল, সেটাও গেলো।

ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষায় আমাদের জাতির মৌলিক চিন্তা শক্তি বা সৃষ্টি শক্তি কতটা ব্যর্থ বা ব্যাহত হয়েছে তার কথা বিশদভাবে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, গান্ধীজী, জাকির হোসেন বলেছেন। তাঁদের ধারণা ইংরেজীনবিশীর ফলে আমাদের জাতি পরাধীন চিত্ত, চিন্তাভিরু, পরভৃতিক দাসমন্য, অন্যের অনুমোদন সাপেক্ষ একটি জরদগবে পরিণত হতে চলেছে। প্রকৃতিবিজ্ঞানগুলি যেহেতু অঙ্ক অথবা সাঙ্কেতিক সেগুলিতে আমাদের দেশের যত মৌলিক অবদান আছে, সমাজ বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় কিংবা মৌল রচনা সৃষ্টিতে যাঁরা মুখ্যত ইংরেজী শিক্ষায় মানুষ তাঁদের অবদান গৌণই বলা যায়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও আমাদের খুব বড়াই করার আছে তা নয়। হিন্দী না শিখে আমরা আপ নেহি জানতে পারতা হায় বলি। আর পনেরো বছর আপ্রাণ ইংরেজী শিখে তার চেয়ে যে খুব ভাল ইংরেজী বলি তা নয়।

কিন্তু এহো বাহ্য। সবচেয়ে বড় কথা এই যে ইংরেজী শিক্ষাকে আমরা আজ আরেকটি সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক লক্ষণরেখায় দাঁড় করিয়েছি। যে ইংরেজী জানে সে ভদ্রলোক, আমাদের লোক, তুমি বা আপনি। যে ইংরেজী জানে না সে ছোটলোক, নীচলোক, তুই, তার সঙ্গে আমার দুস্তর ব্যবধান। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষণরেখা দিয়ে আমরা যেমন শতকরা ৭০ জনকে এখনও ঠেকিয়ে রেখেছি, তেমনি ইংরেজী রাখার জিগির তুলে আমরা ৭০ এর চেয়েও বেশীর ভাগ লোককে যতদিন পারি সমাজে বা সংসারে পদানত করে রাখবো, যাতে তারা কোনদিনই পাশে বসে কথা বলার সাহস না পায়।

যদি সারা পৃথিবীর সঙ্গে, জগতের চিন্তাজগতের সঙ্গে, বিজ্ঞানের সঙ্গে সার্থক যোগসূত্র বজায় রাখতে হয় এবং যা রাখা নিতান্ত বাঞ্ছণীয়, তার জন্যে আমরা যে প্রকারে এবং যতদিন ধরে ইংরেজী শিক্ষা করি তার কোনই প্রয়োজন নেই। অতি দ্রুত, কাজ চালাবার মত এমন কি ভালভাবে পড়বার, বোঝবার মত করে ভাষা শিক্ষা এবং ব্যবহারের যে সব পদ্ধতি, উপায় উপকরণ আজকাল আমাদের দেশ ছাড়া আর প্রায় সবদেশে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে, আমরা তার কিছুই নিতে বা পরীক্ষা করতে রাজী নই, পাছে আমাদের চিরাচরিত মৌরশী পাট্টা টলমলে হয়ে যায়। সে সব প্রথায় অনেক কম সময়ে, অনেক কম ক্লেশে, অনেক ভাল ইংরেজী ভাষা শিখতে ও ব্যবহার করতে পারা যায়। সেই ধরণের শিক্ষা পদ্ধতির পক্ষে দশ থেকে পনেরো বছর বয়সই, অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিকই, সর্বাপেক্ষা অনুকূল। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখি পাঁচ বছর বয়স থেকে ২২ পর্যন্ত নিত্য ইংরেজী পড়েও একটি সামান্য বাক্যের মর্মোদ্ধার করতে অনেক ছাত্রছাত্রী অপরাগ হয়। এদের মধ্যে অনেকেই মেধাবী এবং দুবছরের মধ্যে দ্রুত ইংরেজী ঝালিয়ে নিয়ে সসম্মানে পরীক্ষা পাশ করে। অথচ পাব্লিক বা বিলেতী স্কুলে পাশ করে আসা, রবীন্দ্রনাথের শ্রীবিলাসের ভাষায় যারা ঘন্টায় বিশ পঞ্চাশ মাইল বেগে বাঁকা উচ্চারণে ইংরেজী বলে, সেই সব চটকদার বুলিওলা ছাত্রছাত্রীর পাশে এই সব ইংরেজীতে অনভ্যস্ত অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রী নীচু জাতের লোকের মত প্রায় অপাংক্তেয়, করুণার পাত্র, এমন কি ইতর শ্রেণী। ইংরেজী শিখতে গিয়ে জগদ্বিখ্যাত গুরুদের উপযুক্ত ছাত্র হওয়া ভাগ্যে জুটলোনা, অন্য পক্ষে না শিখলুম অশোকনাথ

বা গৌরীনাথ শাস্ত্রীর কাছে আমার দেশের সংস্কৃত অথবা মহেন্দ্রনাথ সরকার, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বা গোপীনাথ ভট্টাচার্যের কাছে আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও দর্শন। প্রবাদ আছে বুরিদান ভদ্রলোক তাঁর গাধার দুপাশে ঘাস ও বিছালির আটি রেখেছিলেন, বেচারা গাধা ঘাস খাবে কি বিছালি খাবে মনস্থির করতে না পেরে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। আমার মত বহু লোক না এদিক না ওদিক, বুরিদানের গাধার মত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও নিজের দেশের উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্বে পড়ে আছি, আত্মবিশ্বাসহীন অদ্ভুত এক শঙ্কর প্রাণীর মত। প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে অধুনাতন বিক্ষোভ ও অশান্তির এও নিশ্চয় একটি বড় কারণ। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যা পাওয়া উচিত তা পাচ্ছেন না, না জানছেন পশ্চিমকে না পাচ্ছেন নিজের দেশকে, ফলে ব্যর্থতায়, ক্ষোভে, নিষ্ফল আক্রোশে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন।

(৯)

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে পরমশ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ মনীষীরা সহজপাঠ অপাসারণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তখন ডাঃ রায়কে আমি স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। শিশুমানসে উপযুক্ত কথা, ছন্দ, শব্দ, ছবি, বাক্যযোজনা কি অসীম প্রভাব বিস্তার করে, তার চেতনা, কল্পনা, বোধ ও মননকে আবিষ্ট করে' স্থায়ী সুফল বপন করে সে-কথা, যারাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় অথবা রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠমালা পড়ছেন, তাঁরাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। সুতরাং দেশে এত রবীন্দ্রনাথের ভক্ত আছেন তা জানতুম না এই উপহাসে আমার মন সায় দেয় না। কিন্তু এটাও ঠিক শুধু সহজ পাঠেই আজ যদি শিশুর শিক্ষা আমরা সম্পূর্ণ করতে চাই তাহলে আধুনিক শিশুকে আমরা যথোচিতভাবে প্রস্তুত করলুম না।

আমার মনে আছে আমার মেয়ে যখন পাঁচবছরের ছিল তখন কি উল্লাসে সে আবৃত্তি করতো
গঞ্জের জমিদার সঞ্জয় সেন
দুমুঠো অন্য তারে দুইবেলা দেন

কথাগুলির রূপে, রসে, ছন্দে, শব্দে বিভোর হয়ে সে যেন নিজের শরীরে আবেগ অনুভব করতো। দশ বছর পরে 'সভ্যতার সংকট' পড়ে আমাকে একদিন গভীর ক্ষোভে বললো, আচ্ছা 'বাবা' রবীন্দ্রনাথ কেন সহজপাঠে ঐ ধরণের লাইন লিখলেন? আমি বললুম হয়ত শিশুদের মনে দয়ামায়া, দাক্ষিণ্য, অনুকম্পা, সমবেদনা ফুটিয়ে তোলার জন্যে। মেয়ে বললো তা ত বুঝলাম, কিন্তু এভাবে কেন?

তবু আমার বক্তব্য সঞ্জয় সেনের ছড়া নিশ্চয় থাকা উচিত, কারণ, মানুষের বিষয়ে মানুষের বোধের, সেই প্রথম ও আদি আবশ্যিক সোপান। কিন্তু তার সঙ্গে আরো শেখানো উচিত আজকের বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজব্যবস্থা, কৃষিব্যবস্থা, শিল্প ব্যবস্থা, ভূমিব্যবস্থা অর্থ ব্যবস্থা,

উৎপাদন ব্যবস্থা। জানানো উচিত তাদের সরল সহজ ভাষায়, কেন এই অবস্থা এবং বৈষম্য এবং তার প্রতিকারের উপায়। প্রত্যেকের কি কর্তব্য আছে নিজ নিজ সংসারে, সমাজে, রাজ্যে। কি কি প্রকারে গৃহের, পল্লীর,গ্রামের, শহরের পরিবেশ সুস্থ, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর রাখা যায়। তা না হলে স্কুলের শিক্ষা জীবনে প্রাসঙ্গিক হবে কি করে? সে ধরণের শিক্ষার হদিস না পেলে কোন্ প্রত্যাশায় বিত্তহীন বাপমায়েরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের উপার্জন করা বন্ধ রেখে তাদের জোর করে স্কুলে পাঠাবেন? শুধু ছেলেভুলানো ছড়া বা ভাষার ছন্দ শেখানোর জন্য? না এস্কিমোরা কি ভাবে ইগলুতে থাকে তা জানাবার জন্য?

আমরা যতই নীতিকথা উচ্চারণ করিনা কেন আগামী বিশ বছরেও অবস্থা এমন কিছু পালটাবেনা যাতে নাকি অধিকাংশ বিত্তহীন সংসারে শিশুরা বা অল্পবয়স্করা কাজ করে উপার্জন না করলেও সংসার চলবে। শুধু শিশুদের স্কুলে পাঠাও, তাদের কাজ করা বন্ধ করো, বলে দাবী করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। সুতরাং এমন অনেক মেহনতী এবং কারিগরী বিদ্যা অ প্রাপ্ত বয়স্কদের শেখাতে হবে যাতে তাদের উৎপাদনশক্তি ও কার্যক্ষমতা বাড়ে অর্থাৎ রোজগার বাড়ে। শেখাতে হবে তাদের যন্ত্রের ও কলকব্জার ব্যবহার। তারা যে এসব অতি সহজেই শিখতে পারে তার প্রমান আপনি পাবেন শিলিগুড়ির যে কোনও মেরামতি কারখানায়। এবং এ সকল শিক্ষা নিশ্চয় নিজের মাতৃভাষায় সব থেকে ভাল শেখা যায়। তার চর্চা ও বুনিয়াদ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই প্রকৃষ্ট হওয়া উচিত।

একই কারণে নারীদেরও আজ নানা শিল্পে পুরুষদের সঙ্গে সমানে একসাথে শিক্ষা দেয়া ছাড়া উপায় নেই। শেলাই, ফোঁড়াই, বড়ি, আচার, শখের জিনিষ তৈরী শিক্ষার নিগড়ে চীনে মেয়েদের কাঠের জুতোয় আবদ্ধ করে রাখার মত আর কতদিন আমরা আমাদের নারীসমাজকে পঙ্গু করে রাখবো? এবং এ ধরণের নতুন শিক্ষাও মাতৃভাষা ব্যতীত অন্যভাষায় কি সম্ভব?

কিন্তু শুধু নীতি জারি করে ক্ষান্ত হলে চলবেনা। তা হলে সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেয়াই সার হবে, রাজ্যমহাকরণে কালেভদ্রে পোশাকীভাবে ছোটখাটো চিঠি বাংলায় মুসাবিদা বা টাইপ করার মত। উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষার রীতিনীতি, প্রকরণ, উপকরণ, যন্ত্রপাতি, শিক্ষকদের শিক্ষাদান এসব দ্রুত তালে সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন। যতদিন এসব না হবে ততদিন দেশের ৭০ ভাগ লোক অন্ত্যজ, অপাংক্তেয়, তুই-য়ের পর্যায়ে থেকে যাবে। সাক্ষরতা ও শিক্ষা এগোবেনা। ইংরেজী ভাষা শিখে আপনি পর্যায়ে ওঠার জন্য আমাদের যা আগ্রহ তার এক শতাংশও যদি আমরা সাঁওতালী, নেপালী, লেপচা, বোরো, মেচ, কোচ, রাভা ভাষার প্রতি নিয়োগ করতুম তাহলে হয়ত আমাদের এত দুর্দশা থাকতো না।

১০/৪/৮১